বারো ইমামের অনুসারী শিয়াদের দৃষ্টিতে চার ইমাম (আবু হানিফা, মালেক, শাফে'ঈ ও আহমাদ)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ: চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

ইমাম আবু হানীফা নু'মান (রাহিমাহুল্লাহ) [৮০-১৫০হিঃ]*

বংশ পরিচয়: তিনি ইমাম আবু হানীফা নুমান ইবন সাবিত। পারস্যের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পিতৃপুরুষ ছিল কাবুলের বাসিন্দা। কাবুল বিজয়ের সময় তাঁর পিতামহ মুসলিমদের হাতে বন্দী হন। পরবর্তীতে তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। আর আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ যদিও তিনি কোনো গোত্রের মাওলা বা তাদের সাথে ইসলামের ভ্রাতৃত্ববন্ধনে যুক্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি বা তাঁর পিতা কখনো গোলাম ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন স্বাধীন।

জন্ম ও শৈশবকাল: অধিকাংশ বর্ণনা মতে হিজরী ৮০ সালে আবু হানীফা কূফাতে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তাঁর শৈশবকাল কাটে এবং সেখানেই তিনি বড় হন। ইলম অর্জন ও বিতরণের মহানব্রতে জীবনের বেশিরভাগ অংশ তিনি কূফাতেই কাটান।

তাঁর পিতা 'সাবিত'ও মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বলা হয় ছোটবেলায় তিনি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সাক্ষাৎ করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তখন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু তার জন্য এবং তার অনাগত বংশধরদের জন্য বরকত লাভের দো'আ করেছিলেন।

আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ বেড়ে উঠেছেন সম্পূর্ণ ইসলামী পরিবেশে। তিনি তাঁর জীবনযাত্রা শুরু করেন একজন ব্যবসায়ী হিসেবে। তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি ও চিন্তার তীক্ষ্ণতা দেখে 'ফিকহুল হাদীসের'[1] উপর পণ্ডিতব্যক্তি ইমাম শা'বী তাকে ব্যবসায়ের সাথে সাথে আলেমদের মজলিসে হাজির হওয়ার পরামর্শ দেন। এভাবে তিনি ইলমের পথে অগ্রসর হন। কিন্তু সাথে সাথে ব্যবসার কাজও চালিয়ে যান।

ইলম অর্জন: তাঁর সময়কালে ইসলামী জ্ঞানের যেসব শাখা বিদ্যমান ছিল সেগুলোর জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তিনি তার ইলমী জীবন শুরু করেন। 'কুরআনে কারীম' মুখস্থ করেন (আসেমের রেওয়ায়েত অনুযায়ী)। হাদীস অধ্যয়ন করেন। আরবী ব্যাকরণ (নাহু), আরবী সাহিত্য ও আরবী কাব্যের উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করেন। এছাড়া ইসলামী-আকীদা ও তৎসংশ্লিষ্ট মাসয়ালা-মাসায়েল নিয়ে তিনি বাতিল ফেরকাবাজদের সাথে বিতর্কসভায় অংশ গ্রহণ করতেন। এরপর ফিকহের (ইসলামী আইন শাস্ত্র) জ্ঞান অর্জনে নিমগ্ন হন এবং ফিকহের সাথে লেগে থাকেন। এমনকি তাঁর সকল চেষ্টা-সাধনা এ জ্ঞান অর্জনে ব্যয় করে যান। গভীরভাবে পড়াশুনার জন্য তিনি ফিকহশাস্ত্রকে কেন বেছে নিয়েছেন সে সম্পর্কে তাঁর একটি উক্তি রয়েছে। তিনি বলেন, "আমি এ ইলমকে নিয়ে যতবেশী নাড়াচাড়া করি, যতবেশী পড়াশুনা করি এর মর্যাদা ততবেশী স্পষ্টভাবে ফুটে উঠে... আর আমি দেখতে পাচ্ছি- এ জ্ঞান ছাড়া ফরয ইবাদত আদায় করা সম্ভব নয়, দীনে ইসলাম কায়েম করা সম্ভব নয়, ইবাদত-বন্দেগী করা সম্ভব নয়। এমনকি এই জ্ঞান ছাড়া দুনিয়া-আখেরাত কোনোটাই পাওয়া সম্ভব নয়।" এরপর আবু হানীফা সে যামানার বড় বড় আলেমদের সান্নিধ্যে থেকে 'ফতোয়া' নিয়ে গবেষণাকর্ম চালিয়ে যান। ২২ বছর বয়স থেকে তিনি তাঁর ওস্তাদ হাম্মাদ ইবন আবু সুলাইমানের সান্নিধ্যে থাকেন। আবু হানীফার বয়স যখন ৪০ বছর তখন শায়েখ

হাম্মাদ মারা যান। ততদিন পর্যন্ত আবু হানীফা তাঁর সান্নিধ্যে ছিলেন।

তাছাড়া মক্কা ও মদীনায় বসবাসরত অন্যান্য ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসদের কাছ থেকেও আবু হানীফা ইলম নেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। কারণ তিনি খুব বেশী হজ্জে আসতেন। হজ্জে আসলে হারামাইনের আলেমদের কাছ থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন, ফিকহ নিয়ে আলোচনা করতেন এবং তারা যেসব 'সনদ' (হাদীসের বর্ণনাসূত্র) এ হাদীস বর্ণনা করতেন সেগুলো নিয়ে পর্যালোচনা করতেন।

তিনি তাবেয়ীদেরকে খুঁজে বের করতেন, তারা যেখানেই থাকুন না কেন। বিশেষতঃ তাবেয়ীদের মধ্যে যারা সাহাবীদের সান্নিধ্যে থেকে 'ফিকহ' শাস্ত্রে ও 'ইজতিহাদে' ব্যুৎপত্তি অর্জন করেছিলেন তাদেরকে। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, 'উমর, ইবনে মাসউদ ও ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমের ছাত্রদের কাছ থেকে আমি তাদের ফিকহী জ্ঞান গ্রহণ করেছি।"

চল্লিশ বৎসর বয়সে আবু হানীফা কূফার মসজিদে তাঁর ওস্তাদ হাম্মাদের স্থলাভিষিক্ত হয়ে ইসলামী জ্ঞান দান শুরু করেন। তাঁর কাছে যেসব 'ফতোয়া' ও 'বিচার' আসত তিনি ছাত্রদের কাছে সেসব মাসয়ালার সমাধানগুলো বিশ্লেষণ করতেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও যুক্তির আলোকে প্রত্যেকটি মাসয়ালাকে তার সাদৃশ্যপূর্ণ অন্য মাসয়ালার সাথে তুলনা করতেন। এভাবেই তিনি ইসলামী আইন (ফিকহ) শাস্ত্রের বিধি-বিধান নির্ণয়ের একটি পদ্ধতি দাঁড় করাতে সক্ষম হন। যা থেকে বেরিয়ে আসে 'হানাফী মাযহাব'।

তাঁর আখলাক: আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ ছিলেন অত্যন্ত দ্বীনদার-পরহেযগার, খুব বেশী ইবাদতগুজার। তিনি দিনে রোজা রাখতেন, রাতে তাহাজ্জুদ পড়তেন এবং প্রচুর কুরআন তেলাওয়াত করতেন। তিনি ছিলেন আল্লাহ্র ভয়ে কম্পিত ব্যক্তি। একাধারে ত্রিশ বছর তিনি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়েছেন। কুরআন ছিল তার সবসময়ের সাথী, একান্ত বন্ধু।

তাঁর অন্যতম গুণ ছিল সহিষ্ণুতা ও বদান্যতা। ব্যবসার মাধ্যমে তাঁর হাতে প্রচুর অর্থ আসত। যদিও তিনি ছিলেন অত্যন্ত পরহেজগার এবং যৎসামান্য লাভে ব্যবসায়িক লেনদেন করতেন। তাঁর সম্পদের বেশীরভাগ অংশ তিনি আলেম-ওলামা ও মুহাদ্দিসদের জন্য ব্যয় করতেন। তাঁর প্রতি আল্লাহ্পাকের অনুগ্রহের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি এ দান করতেন।

ফুযাইল ইবন ইয়ায তাঁর ব্যাপারে বলেন, "আবু হানীফা ছিলেন একজন বিজ্ঞ লোক, ফিকহ শাস্ত্রে নামকরা আলেম, অঢেল সম্পদের মালিক। তাঁর কাছে তশরীফ নেয়া কাউকে কিছু না-দিয়ে বিদায় করতেন না। অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে রাতদিন ইলম অর্জনে মশগুল থাকতেন। তিনি ছিলেন রাতগুজার, অল্পভাষী, অতি নীরব। কিন্তু হালাল-হারামের সাথে সম্পৃক্ত কোনো মাসয়ালা উত্থাপিত হলে তিনি মুখ খুলতেন এবং সঠিক মতের পক্ষে সুন্দরভাবে দলীল পেশ করতেন। রাজা-বাদশাহ্র সম্পদ থেকে তিনি দূরত্ব বজায় রেখে চলতেন।

তাঁর ইল্মী মর্যাদা ও ইলমের সূত্র: আবু হানীফা ছিলেন একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ ফিকহবিদ। ফিকহের ক্ষেত্রে তিনি একটি স্বতন্ত্র পথে চলেছেন এবং এ অঙ্গনে গভীরতা অর্জন করেছেন। এ কারণে প্রজন্মের পর প্রজন্মের মুখে তাঁর স্তুতির প্রতিধ্বনি শোনা যায়। জনৈক আলেম বলেন, 'আমি আবু হানীফার সান্নিধ্যে পাঁচ বছর কাটিয়েছি। তাঁর চেয়ে বেশী সময় নীরব থাকে এমন আর কাউকে আমি দেখিনি। কিন্তু যখন ফিকহের ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন করা হত তখন তিনি ছিলেন উপচেপড়া পানিতে ভেসে যাওয়া উপত্যকার মত। তাঁর গুনগুনানি শব্দ এবং উচ্চকণ্ঠ দুটোই আমি শুনেছি।" তাঁর সমসাময়িক পরহেজগার, তাকওয়াবান আলেম আব্দুল্লাহ্ ইবন মুবারক বলেন, "তিনি

হচ্ছেন ইলমের মস্তিষ্ক। তিনি ইলমের নির্যাস পেয়েছেন এবং তার সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছতে পেরেছেন।"

তাঁর গুণাবলী: আবু হানীফার এমন কিছু গুণ ছিল যে গুণগুলো তাকে আলেমদের শীর্ষে পৌঁছিয়েছে। ঠিক একজন হাক্কানী, নির্ভরযোগ্য আলেমের যেসব গুণ থাকা উচিত। তিনি ছিলেন সুপ্রসন্ন চিন্তার অধিকারী। খুঁটিনাটি বিষয়ও তিনি জানতেন। তড়িৎ চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন।

নিজেকে সংযত রাখতে এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণে তিনি ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতাবান। তাঁকে লক্ষ্যকৃত কোনো বিদ্বেষপূর্ণ কথায় তিনি কান দিতেন না। কোনো কটু কথা তাকে সত্য থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। তিনি বলতেন, "হে আল্লাহ্, যাদের অন্তরে আমাদের স্থান হয়নি, আমাদের অন্তর তাদের জন্য রয়েছে প্রসারিত।" তিনি ছিলেন স্বাধীনচেতা। এ কারণে তাঁর নিজস্ব কোনো মত কুরআন, হাদীস বা কোনো সাহাবীর ফতোয়ার বিপরীতে না গেলে তিনি তা পরিহার করতেন না।

'হক্ব' সন্ধানে ছিলেন একনিষ্ঠ, অকপট। যা তার হৃদয় ও বিবেককে আলোকিত করেছিল। হারজিত যাই হোক না কেন 'হক্ব'টাকেই তিনি গ্রহণ করতেন। এ একনিষ্ঠতার কারণে তিনি নিজের মতটাকে ভুলের উর্ধ্বে মনে করতেন না। বরং বলতেন, "আমাদের বক্তব্যটা একটা মতামত মাত্র। আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টার পর এ সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে পেরেছি। কেউ যদি আমাদের মতের চেয়ে উত্তম কোনো মত নিয়ে আসে তাহলে সেটা হবে আরো বেশী যথাযথ।"

এসব মহান গুণাবলীর কারণে আবু হানীফা রাহিমাহুল্লাহ এমন একজন ফকীহ ছিলেন যিনি নাগালে পাওয়া সব ধরনের আত্মিক খাদ্য (ইলম) থেকে উপকৃত হতে পেরেছেন।

যেসব শিক্ষাগুরু ও শিক্ষা-উপদেষ্টা দ্বারা তিনি প্রভাবিত হন: যেসব সাহাবী দীর্ঘায়ু পেয়েছিলেন আবু হানীফা রাদিয়াল্লাহু 'আনহু তাদের বেশ কয়েকজনের সাক্ষাত পেয়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন- আনাস ইবন মালিক, আব্দুল্লাহ্ ইবন আবী আওফা, সাহল ইবন সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)। তবে তিনি তাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করতে পারেননি। কারণ সেসময় তার বয়স ছিল কম। তবে আলেমদের সর্বসম্মতিক্রমে তিনি বড় বড় তাবেয়ীদের সাক্ষাত পেয়েছেন, তাদের সাথে উঠাবসা করেছেন, ইলমের আদান-প্রদান করেছেন এবং তাদের কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহ শাস্ত্রের জ্ঞান গ্রহণ করেছেন।

তিনি বলেন, "আমি ইলম ও ফিকহের সুতিকাগারে ছিলাম। আলেম ও ফকীহদের মজলিসে আমি হাজির হতাম এবং তাদের একজনের ঘনিষ্ঠ ছাত্র ছিলাম।"

এতে প্রমাণিত হয় যে, তিনি ইলমী পরিবেশে ছিলেন, আলেমদের মজলিসে হাজির হয়েছেন এবং তাদের গবেষণার পদ্ধতিগুলো আয়ত্ব করতে পেরেছেন। অবশেষে তাদের মধ্য থেকে একজন ফকীহকে বাছাই করে নেন। যার পদ্ধতির সাথে তাঁর ইলমী ঝোঁকপ্রবনতা খাপ খেয়েছিল। তিনি হচ্ছেন 'হাম্মাদ ইবন আবি সুলাইমান'। যিনি তার সময়কালে ইরাকের ফিকহের পণ্ডিতদের শীর্ষে ছিলেন। সুতরাং তিনি সুদীর্ঘ আঠারো বছর তার সান্নিধ্যে কাটান। সার্বক্ষনিক সাথী হিসেবে থাকেন।

হাম্মাদ ফিকহশাস্ত্রের অধিকাংশ জ্ঞান গ্রহণ করেন 'ইব্রাহীম নাখায়ী' থেকে। তার ফিকহ ছিল যুক্তিনির্ভর। আবার শা'বীর কাছ থেকেও তিনি ফিকহ গ্রহণ করেন। তার ফিকহ ছিল হাদীস নির্ভর। আর এ দুজন ফিকহের জ্ঞান গ্রহণ করেছেন দুজন সাহাবীর কাছ থেকে। তারা হলেন, 'আব্দুল্লাহ্ ইবন মাসউদ' ও 'আলী ইবন আবী তালেব' রাদিয়াল্লাহু 'আনহু। এ দু'জন সাহাবী কূফাতে বসবাস করেন এবং কূফাবাসীর কাছে ফিকহের বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার

রেখে যান।

এছাড়া আবু হানীফার শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন, 'আতা ইবন আবী রাবাহ্'। 'আতা' রাহিমাহুল্লাহ আব্দুল্লাহ্ ইবন আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু জ্ঞানের সার-নির্যাস গ্রহণ করেছেন ইকরিমার কাছ থেকে। ইকরিমা ছিলেন ইবনে আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু আযাদকৃত দাস ও তাঁর একান্ত ছাত্র। যখনি আবু হানীফা বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী হতেন তখনি 'আতা ইবন আবী রাবাহ এর সান্নিধ্যে থাকতেন।

আবু হানীফার শিক্ষকদের মধ্যে আরো রয়েছেন- ইবনে উমরের আযাদকৃত দাস 'নাফে'। তার সান্নিধ্যে থেকে আবু হানীফা 'ইবনে উমর' ও 'উমরের' রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ফিকহের জ্ঞান গ্রহণ করতে পেরেছেন। এভাবে তিনি উমর, আলী, ইবনে আব্বাস, ইবনে মাসউদ ও ইবনে উমরের রাদিয়াল্লাহু 'আনহু ইলম গ্রহণ করতে পেরেছেন তাদের ছাত্রদের কাছ থেকে। আবু হানীফা শুধু এসব ফকীহদের কাছ থেকে ইলম নিয়ে ক্ষান্ত হননি; বরং রাসূলের সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বংশধরদের কাছ থেকেও ইলম গ্রহণ করেছেন, তাদের কাছে পড়েছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইমাম যায়েদ ইবন আলী, মুহাম্মদ ইবন বাকের, জাফর সাদেক, আব্দুল্লাহ্ ইবন হাসান ইবন হাসান।

অগ্নি পরীক্ষা ও তাঁর মৃত্যু: আবু হানীফার সময়কালটা ছিল নানান ধারার চিন্তাচেতনা ও ফেতনা-ফাসাদে ভরপুর। বনী উমাইয়া ও বনী আব্বাসের সাম্রাজ্যদ্বয়ের শাসনকাল তিনি পেয়েছেন। একবার উমাইয়াদের শাসনাধীন কূফার গভর্নরের পুত্র আবু হানীফার কাছে তলব পাঠাল তার সাথে সহযোগিতা করতে হবে। তখন তিনি তার সাথে সহযোগিতা করতে অসম্মতি জানান। যার ফলে তাকে কারারুদ্ধ করে নির্যাতন করা হয়। পরবর্তীতে তিনি পালিয়ে মক্কায় এসে আশ্রয় নেন এবং ১৩০-১৩৬ হিঃ পর্যন্ত সময়কালে তিনি মক্কাতে অবস্থান করেন। পবিত্র মক্কা ছিল ইবনে আব্বাসের ইলমের প্রাণকেন্দ্র। সেখানে অবস্থান করে তিনি ইবনে আব্বাসের শিষ্যদের কাছ থেকে হাদীস ও ফিকহের জ্ঞান অর্জন করেন।

যখন ইসলামী সাম্রাজ্যের নেতৃত্বের ভার আব্বাসীদের হাতে আসল তখন তিনি কূফাতে ফিরে যান এবং আব্বাসীদের আনুগত্য ঘোষণা করেন। কূফায় ফিরে সেখানকার মসজিদে ইলম শিক্ষা দেওয়ার কাজ পুনরায় চালু করেন। আব্বাসীদের সাথে তার মিত্রতা দীর্ঘদিন অটুট ছিল। কিন্তু বাহ্যতঃ যা মনে হচ্ছে- আলে বাইতের কোনো এক সদস্যের প্রতি অর্থাৎ আলী রাদিয়াল্লাহু 'আনহু এর উত্তর পুরুষদের কারো একজনের প্রতি খলিফা মনসুরের বিরূপ অবস্থানকে তিনি সমালোচনা করেন। এছাড়াও খলিফার আশেপাশে এমন অনেক লোক ছিল যারা আবু হানীফার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করত এবং তাঁর বিরুদ্ধে মনসুরকে উস্কে দেওয়ার চেষ্টা করত। যার ফলে খলিফা মনসুর তাঁর ইখলাস পরীক্ষা করার জন্য তাঁর কাছে কাজীর (বিচারকের) দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব পাঠান। ভুল বিচার করে গুনাহে লিপ্ত হওয়ার ভয়ে ইমাম এই পদ গ্রহণে অস্বীকৃতি জানান। কারণ তিনি মনে করতেন 'কাজী বা বিচারকের পদের মত একটি স্পর্শকাতর পদের দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি যোগ্য নন। তাঁর এই অস্বীকৃতির কারণে তিনি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন। সুযোগ পেয়ে মনসুর তাঁকে বন্দী করে তাঁর উপর নির্যাতন চালায়। তারপর এই শর্তে তাকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয় যে, তাকে ফতোয়া দিতে হবে। কিন্তু তিনি কোনো ফতোয়া না দিয়েই মাসয়ালাগুলো ফেরত পাঠিয়ে দিতেন। এরপর পুনরায় তাকে জেলে পাঠানো হয়। তারপর আবার জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। কিন্তু এবার ফতোয়া দেওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, মানুষের সাথে দেখা সাক্ষাত বন্ধ করে দেওয়া হয়। এমনকি বাড়ী থেকে বের হওয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মৃত্যু অবধি তিনি এ অবস্থায় ছিলেন। সঠিক বর্ণনা মতে ১৫০ হিজরীতে তিনি মারা যান। কোনো কোনো বর্ণনা মতে,

কারাগারে বিষ পান করিয়ে তাঁকে হত্যা করা হয়।

তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী তাকে 'খায়যারান' এলাকায় দাফন করা হয়। অনুমান করা হয় তাঁর জানাযাতে পঞ্চাশ হাজার লোক শরীক হয়েছিল। তাঁর উচ্চমানের দ্বীনদারী ও আল্লাহ্‌ভীতির স্বীকৃতি দিয়ে খলিফা মনসুর নিজেই তাঁর জানাযায় শরীক হন। মনসুর তাঁর ব্যাপারে বলেন, "জীবিত বা মৃত কোন সে ব্যক্তি যে আমার জন্য আপনার কাছে ক্ষমা চাইবে?"

আল্লাহ্‌ তায়ালা ইমাম আবু হানীফার প্রতি রহম করুন, তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করুন।

>

ফুটনোট

* ইমাম মুহাম্মদ আবু যাহরার "ইমাম আবু হানীফা হায়াতুহু ওয়া আসরুহু আ-রাউহু ওয়া ফিক্‌হুহু" শীর্ষক গ্রন্থের সহযোগিতা নিয়ে এই জীবনী লেখা হয়েছে।

[1] ফিকহুল হাদীস: যে শাস্ত্রে হাদীসের গ্রন্থগুলোর বিন্যাসের আলোকে ফিকহী মাসয়ালা-মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করা হয়।- অনুবাদক

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9864

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন